ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেলো যারা জীবনের জয়গান

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ তালহা

১২৮০ হিজরীর মে মাস। দুই তারিখ। ইংরেজ বিচারক এ্যাডওয়ার্স আম্বালার কোর্টে বসা। পাশে বসে আছে চারজন পরামর্শদাতা সহযোগী। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি তারা।

তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এগারজন লোক। তাদের চেহারায় জ্বলজ্বল করছে আভিজাত্য আর অসম্ভব নিষ্পাপতা। কিন্তু আজকের কাঠগড়ায় এরাই সবচেয়ে বড় আসামী। এদের অপরাধ হলো এরা হিন্দুস্তানে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এরা সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ও বীর মুজাহিদ শায়খ ইসমাইল শহীদ ও তাঁদের জামাতকে আফগান সীমান্তে সেচ্ছাসেবক পাঠিয়ে ও অর্থ-কড়ি দিয়ে সাহায্য করে। এসব সাহায্য তারা দেশের অভ্যন্তর থেকে অত্যন্ত গোপনে নিখুঁত কৌশলে পাঠিয়ে থাকে। এসব প্রেরণের সময় তারা সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে।

এরা সাহায্য সামগ্রীগুলো ইংরেজদের অধিনস্ত মুসলিম প্রজাদের থেকেই উসুল করে। এবং এগুলো ব্যবহৃত হয় ইংরেজদের বিরুদ্ধেই। এটা তো সহ্য করা যায় না। প্রথমটায় এ খবর ছিলো অত্যন্ত গোপন। এক খবিস টাকার লোভী গাদ্দার মুসলিম সৈনিকের মাধ্যমে এ খবর ইংরেজ সরকারের কাছে প্রকাশিত হয়ে যায়। ফলে সরকার এদেরকে পাটনা, থানেশ্বর ও লাহোর থেকে আটক করে। আজকের দিন তাদের মামলা শুনানির দিন। ইংরেজ বিরোধিতার উপযুক্ত বিচার হবে আজ। হয় ফাসী, নয় দেশান্তর।

ফায়সালা শোনানোর সময় ঘনিয়ে এলো। দর্শকরা বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে আছে। হৃদয়গুলোতে ঝড় বইছে। ধীরে ধীরে হলঘরে নেমে এলো সুনসান নিরবতা।

বিচারক দরাজ গলায় অগ্নিশর্মা হয়ে এক যুবককে উদ্দেশ্য করে বলা শুরু করলো। যুবকটি যেন মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ নেয়ামত। উচ্চ বংশের স্পষ্ট ছাপ তার চেহারায়।

বিচারক: শোনো জাফর! তুমি একজন জ্ঞানী ও শিক্ষিত ছেলে। তুমি বেশ ভালো করেই জান দেশের আইন কানুন। তুমি তোমার এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি। অথচ তুমিই কি না সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত। বিদ্রোহীদের শহরে অর্থ এবং লোক পাঠানোর মাধ্যম তুমি? কাজটি করে তুমি বড় হঠকারী ও অন্যায় আচরণ করেছ। এ দেশের বৃটিশ সরকারে অনুগত নও তুমি। সুতরাং আমি এই ফায়সালা দিচ্ছি যে, তোমাকে ফাসীর কাষ্ঠে ঝুলানো হবে। এবং তোমার যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে। মৃত্যুর পর তোমার শবদেহও পরিবারের নিকট অর্পণ করা হবে না। হতভাগাদের গোরস্তানে তাদের সাথেই তোমার দাফন হবে। তোমায় ফাসীর রজ্জুতে ঝুলতে দেখে আমরা যারপরনাই আনন্দিত হব।

পরম স্থিরতা ও গাম্ভীর্যের সাথে সবকথা শুনল যুবক। সামান্য বিচলিত ভাব নেই তার মাঝে। কাজির কথা শেষ হলে সে বলল, ‘জীবন মৃত্যুর মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ তা‘আলা। শোনো বিচারক! তোমার হাতে কারো জীবন-মৃত্যু নেই। তুমি এও জানো না যে, আমাদের মাঝে কে আগে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে।’

যুবকের কথা শুনে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলে উঠল ইংরেজ বিচারক। ক্রোধে উন্মাতাল হয়ে গেল, কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। কেননা এতক্ষণে সে তার তুনীরের শেষ তীর নিক্ষেপ করে ফেলেছে, চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে দিয়েছে।

এদিকে মৃত্যুর সংবাদ শুনে জাফর পরমানন্দে উদ্বেলিত। খুশিতে তার চেহারা অষ্টাদশির চন্দ্রের মত ঝলমল করছে। যেন সে দেখতে পাচ্ছে জান্নাত ও তার মনোলভা দৃশ্য। তার সামনে যেন হাজির হয়েছে উদ্ভিন্ন যৌবনা জান্নাতী রমণীকুল। গেলমানেরা সব দাঁড়িয়ে আছে তাসনীম ঝরণার সুমিষ্ট পানি হাতে। সে কবিতা আবৃত্তি করল- ‘আলহামদুলিল্লাহ! যে বস্তু আমার অন্তর কামনা করছিল, অবশেষে তা তাকদীরের পার্দার আড়াল থেকে প্রকাশিত হলো’।

চরম বিস্ময়ে হতবাক সবাই। এক ইংরেজ অফিসার এগিয়ে এসে জাফরকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমি আজ পর্যন্ত এমন দৃশ্য দেখিনি। কীভাবে ফাঁসির আদেশ শুনেও তুমি আনন্দিত?

তার উত্তরে জাফর বলল, আমি তো হাসবই। আমিই আজ আনন্দিত হব। কারণ সারা জীবনের পরম সাধ, আল্লাহর পথে শাহাদাত, আজ আমি অর্জন করতে চলেছি। আমি খুশি হব না তো তুমি খুশি হবে মূর্খ কোথাকার?

আরো দুজনের ব্যাপারেও ফাঁসির আদেশ হলো। তাদের একজন বয়োবৃদ্ধ। তাঁর চেহারা থেকে প্রকাশ পাচ্ছে আল্লাহ-ভিতি ও এবাদত-সাধনার আলামত। ইনিও উৎফুল্ল চিত্তে মৃত্যুর পরোয়ানা শুনলেন। এ শায়খের নাম হলো মাওলানা ইয়াহইয়া আলি সাদেকপুরি। তিনিই আমীর এ জামাতের।

দ্বিতীয়জন এক যুবক। তার বাড়ি পাঞ্জাবে। নাম মুহাম্মদ শফী। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে, সে কোন ধনাঢ্য ঘড়ের আদরের সন্তান। বাকি আট জনের ব্যাপারে যাবজ্জীবনের ফায়সালা শোনানো হলো।

উপস্থিত জনতা ব্যথাতুর চিত্তে হতাশা জর্জরিত হৃদয়ে ফায়সালাগুলো শুনল। তাদের হৃদয়গুলো হু হু করে কেঁদে উঠল। মনের ব্যথা চোখের জল হয়ে গড়িয়ে পড়ল। মজলুমদের জেলতক চলার পথের দুধারে নারী-পুরুষ সাঁড়ি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল।

অভিযুক্তরা জেলে পৌঁছল। তাদের গায়ের পোশাক খুলে কয়েদীর পোশাক পড়িয়ে দেয়া হলো। তিনজনের প্রত্যেককে একটি সংকীর্ণ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী রাখা হলো, যেখানে প্রবেশ করতে পারে না সামান্য আলো ও বাতাস, এবং সেখানে নেই এগুলোর প্রবেশাধিকার।

অথচ এমন বসবাসের অযোগ্য স্থানে তারা পরম শান্তি ও অত্যন্ত আনন্দের মাঝে রাত অতিবাহিত করল। সকালে তাদের মৃত্যুর পরোয়ানা সম্বলিত একটি চিঠি এলোÑ‘অপরাধীদের ফাঁসি হবে জনসম্মুখে, ময়দানে’।

জেল সুপার তাদের চোখের সামনেই ফাঁসির রশি প্রস্তুত করছিল। এরাও প্রশান্তচিত্তে তা প্রত্যক্ষ করছিলেন। তাদের অন্তরে নেই সামান্য ভয় ও দু:খ-বেদনার আভাস। এদের মধ্যে মাওলানা ইয়াহইয়া ছিলেন বেশি প্রফুল্ল। জান্নাতের ভালোবাসায় এখুনি বুঝি তিনি জান্নাতে চলে গিয়েছেন। আবেগমাখা কণ্ঠে তিনি আবৃত্তি করছিলেন হযরত খুবাইবের (রা)এর অমর চরণগুলোÑ

‘মৃত্যুকে কোন পরওয়া করি না যদি মৃত্যু হয় মুসলিম হয়ে। এবং এও ভাবি না যে, কোথায় মৃত্যু হল।

এ মৃত্যু যেহেতু খোদার জন্য, তাই তিনি চাইলে সকল অঙ্গে বরকত দান করবেন’।

আল্লাহর রাহের এই মুজাহিদদের সাথে ছিল সদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারা; প্রশান্ত হৃদয়; তুষ্ট ও সন্তুষ্ট মন। তাদের কাজ ছিল খুশুর সাথে নামাজ আদায় করা। প্রতিযোগিতার সাথে এবাদত করা। যিকির-তাসবীহ ও তেলোয়াতে কোরআন ছিল তাদের সময় অতিবাহিত করার পাথেয়। আর মাঝে মাঝে আবেগতাড়িত হয়ে কবিতার চরণ আবৃত্তি করাও ছিল তাদের ব্যস্ততার অংশ।

ফায়সালা হয়ে যাওয়ার অনতিকাল পরই ফাঁসির রায় দানকারী কাজি মারা গেল। ইংরেজ অফিসার বার্সেন উন্মাদ হয়ে গেল। এ দুষ্ট লোকটা মুহাম্মদ জাফরকে গ্রেফতার করেছিল। তাকে সকাল আটটা হতে রাত আটটা পর্যন্ত বেদম প্রহার করত। উন্মাদনার প্রাবল্যে এও একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। আল্লাহর রাসুল (সা) এর বাণী চিরসত্য- ‘কতিপয় সরল মনের উস্কোখুস্কো চুলের লোক আছে যারা আল্লাহর নাম নিয়ে যে কসমই করে আল্লাহ তা পূরণ করেন’।

কয়েদখানায় ইংরেজ নারী-পুরুষের ভীর জমে গেল। হাসিমুখে মৃত্যু-পরোয়ানা গ্রহণকারী লোকগুলোকে এক নযর দেখতে তাদের এই ভীর। কয়েদীদের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা আর ভাবলেশহীন ওঠাবসা তাদের মাঝে বিস্ময়ের ঝড় তুলল। ইংরেজরা জিজ্ঞেস করল, আরে তোমরা ফাঁসির কাষ্ঠে দাঁড়িয়েও নিশ্চিন্ত কীভাবে?

কয়েদীরাতাদের উত্তর দিল, এ হলো শাহাদাত লাভের আনন্দ। যে শাহাদাত আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় নেয়ামত। এই দর্শনার্থীরা আবার এখান থেকে গিয়ে ইংরেজ

লিডারদেরকে এসব কথা বলত। এতে অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত তারা জ্বলে উঠত। কিন্তু কিছুই করার উপায় নেই আর। যদি তাদেরকে মুক্ত করে দেয় তাহলে হাতের মুঠো থেকে শত্রুকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর তাদেরকে হত্যা করলে তো তাদের আজীবনের আশা পূরণের ব্যবস্থা করা হবে। এসকল বিষয় জগদ্দল পাথরের মত ইংরেজদের মাথার উপর বোঝা হয়ে রইল।

তারা খুব চিন্তা ভাবনা করে শেষতক হত্যা ও ছেড়ে দেয়ার মাঝামাঝি এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করল। ইংরেজ জাতির কূটকৌশলের বিষয় সবার সুবিদিত। একদিন প্রভাতে এক সেপাহী এসে নতুন ঘোষণা পড়ে শোনালÑ ‘হে মুসলিম কয়েদীরা! শোন, তোমাদের আশা পূরণ হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। আমরা তোমাদের হত্যা করে তোমাদেরকে খুশি করতে চাই না। এজন্য ফাঁসির আদেশ বাতিল ঘোষণা করা হল। তোমাদের জন্য শাস্তির ফায়সালা হয়েছে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যাবজ্জীবন কারাদন্ড। আমরা তোমাদেরকে কাঙ্খিত বস্তু লাভ করে উৎফুল্ল দেখতে চাই না’।

১৮৬৫ খৃস্টাব্দের আট তারিখে তাদেরকে পৌঁছে দেয়া হলো আন্দামান দ্বিপপুঞ্জের বোর্ড বেলার-এ। এখানে আসার দুবছরের মাথায় এবাদতরত অবস্থায় ইন্তিকাল করলেন সবচেয়ে প্রবীণ মুজাহিদ ইয়াহইয়া আলী। যতদিন বেঁচেছিলেন তার জীবনে শুধুই নেক আমল ও দাওয়াত ইলাল্লাহ ছিল। মাওলানা জাফর থানেশ্বরীর ব্যাপারে ক্ষমার ফায়সালা হলো। তাকে ১৮৮৩ সালের বারোই জানুয়ারী মুক্তি দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে দেশান্তরিত হয়ে কেটে গেছে তাঁর জীবনের মূল্যবান আঠারটি বছর।

মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন, ‘মুমিনদের মাঝে কিছু এমন আছে তারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গিকার পূরণ করে। তাদের কারো জীবন শেষ হয়ে যায়। কেউবা অপেক্ষায় থাকে মৃত্যুর। আর তারা কথার এদিক সেদিক করে না’।